সামান্য হিন্দি-বিরোধের সকারাত্মক পক্ষ : কিঞ্চিত নীতিগত পরামর্শ যাহা এক উত্তম ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকের রূপে কাজ করিতে পারে

সৃজন সাধুখাঁ (হিন্দুস্তানি থেকে বঙ্গানুবাদ – লেখক স্বয়ং)

আমি এতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন একজন মলয়ালী কলম-মিত্র কে করতে চাই, যাঁর সাথে পরস্পর অনেকগুলো চর্চা করতে করতে উত্তর ও দক্ষিণের ভাষাগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক, সমসাময়িক অন্তর্দেশীয় এবং বিদেশী প্রভাবগুলোর এবং আঞ্চলিক প্রভাভগুলোর ওপর তথ্য পাওয়ার সুযোগ পেলাম।

হিন্দি ভাষা সমস্ত উপমহাদেশে কোনও না কোনও কারণে চর্চিত, সেটা বা সকারাত্মকভাবেই হোক বা, সেই নকারাত্মক। কিন্তু তার চর্চা তো আছে, আর চলতেই থাকবে।

চলুন নকারাত্মক দিকটা দেখা যাক, হিন্দির বিরোধের এই দিকটা রাজনৈতিক মাত্র। উত্তরবিদ্বেশিতার ভাবনা এতে সমাহিত। বিধর্মী প্রকৃতিও একটি কারণ ('বিধর্মী'র প্রসঙ্গ এখানে ধার্মিক ও ঐতিহাসিক)। ব্রাহ্মণবিদ্বেশিতাও এর আরেক কারণ।

হিন্দির বিরোধ জায়েZ কিনা সেটা তো আমরা কিছুক্ষণ পরে এটার চর্চা করবো। আমাদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ সেটা এই যে এর বিরোধ কেমন ধরণের হওয়া উচিত, বিরোধের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত ও বিরোধে নিহিত চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত। ও যেখানে ভাষীয় রাজনীতিকরণের প্রসঙ্গ উঠে আসে নিঃসন্দেহে এটা নাজায়েZ। আত্মদাহের পাগলামোর মানসিকতা কাপুরুষতার পরিচায়ক নাকি বলিদানের (দয়া করে এটার সাথে সতীদাহের অথবা জৌহরের মিল খুঁজতে যাবেন না, যদিও এদের গুরুত্ব

আজকের দিনে ক্রমশ কমে যাচ্ছে বা কমে গেছে)। আমি এর বিষয়ে কিছু দৃষ্টিকোণ একটি অন্য লেখায় যৌক্তিক ভাবে করবো।

(আমি এখানে 'হিন্দি' বলতে হিন্দি ও উর্দু দুটোকেই সম্মিলিত করছি যাতে ব্যাপারগুলোয় স্পষ্টতা আসে, প্রসঙ্গভেদে আলাদা করে 'প্রমিত হিন্দি' ও 'উর্দু' পদগুলোর প্রয়োগ করা হবে।) হিন্দি ভাষা নিঃসন্দেহে একটা উপমহাদেশ-ব্যাপী ভাষা যার প্রসার সরকারি কার্যকলাপ, মনোরঞ্জন, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সম্পর্ক ভাষার রূপে হয়ে চলে এসছে। দেশে-বিদেশে এর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় ও আমাদের দক্ষিণবাসী সাধারণ জনগণ ভাইবোনেরাও সাধারণত এর প্রতি সহিষ্ণু।

যাহাঁতক ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা আসে, এমন নয় যে সবাই দ্বিভাষী, কিন্তু এটাও সত্য যে চেষ্টা করলে কোথাও না কোথাও অন্তত (না বললেও) হিন্দি বোঝার কয়েকজন পেয়ে যাবেন। একটি ভাষা তখন সম্পর্ক-ভাষার রূপ এক্তিয়ার করে যখন লোকেরা ভাঙা-চোরা স্বরূপে হলেও যথাসম্ভব অন্যভাষী সমাজ(গুলো) পর্যন্ত নিজের কথা সম্ভাষিত করাতে কাজে লাগায়। আর একে কিঞ্চিত সীমা পর্যন্ত অথবা মূলরূপে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে শোনা, বলা ও বোঝা যায়। এর তাৎপর্য এই নয় যে সম্পর্ক ভাষা জানার লোকেরা হামেশাই একাডেমীয় স্তরে পরা-লেখায় সক্ষম। এর অনেক কারণ বিদ্যমান, যেমন, উচ্চারণ ভেদ, বানান ভেদ, ব্যাকরণ ভেদ ইত্যাদি।

কিছু কট্টর আঞ্চলিক(তাবাদী) লোকেরা এই কারণে চায় যে হিন্দি কে না 'চাপানো' হয়, কিছু লোকেরা চায় যে 'হিন্দি'কেই সমাপ্ত করে দেওয়া হোক, আস্তে আস্তে লোকেরা আরও বেশি হিন্দির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এমন সময়ে একটি ভুল ধারণা জন্মায় যে হিন্দি কেন না একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা তাই একে ভাষীয় সাম্রাজ্য বলে বোঝানো হচ্ছে, যদিও উত্তর ভারতে আমাদের অনুভব এরচেয়ে ভিন্ন। ধরা যাক যে কিছু এলাকার সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি কে গৃহীত করা হয়েছে, কিন্তু 'হিন্দি পট্টি'র কিছু অঞ্চলের নিজস্ব বৈচিত্র্য আছে। আরও, আঞ্চলিক স্তরে আলাদা আলাদা ভাষাগুলোর সম্মান দিনে

দিনে বাড়ানো হচ্ছে। কিছু 'হিন্দি প্রদেশে' এগুলো পড়ানোও হচ্ছে। কোথাও কোথাও এদেরকে সরকারি ভাষার মর্যাদাও প্রদান করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানা দক্ষিণের একমাত্র পূর্ণ রাজ্য যেখানে একাধিক সরকারমান্য রাজভাষা আছে। এর বিপরিতে 'হিন্দি প্রদেশে' ছত্রিশগড়ে হিন্দি ও ছত্রিশগড়ি রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ঝাড়খণ্ড ১৭টি ভাশাকে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃত করলো, এ শুধুই 'হিন্দি প্রদেশগুলোর' মধ্যেই নয়, বরং সমস্ত ভারতবর্ষে সর্বাধিক (উর্দু, বাংলা, সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, খড়িয়া, কুড়ুখ/ওরাঁও, কুড়মালি, খোরঠা, নাগপুরি/সাদরি, পঞ্চপরগনিয়া, উড়িয়া, মগধী, মৈথিলী, ভোজপুরি, অঙ্গিকা)। 'অহিন্দি প্রদেশগুলোর' মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র এমন রাজ্য যেখানে অন্যান্য ভাষাগুলোকে অঞ্চলবিশেষে সরকারি ভাষাও বানালো তার সাথে সাথে সরকারি ভাষাগুলোর সঙ্খ্যায় বৃদ্ধিও ঘটালো। এটাও বলে রাখি যে পশ্চিমবঙ্গে প্রমিত হিন্দি একটি সরকারি ভাষা, শুধু এটাও না, পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সর্বাধিক গর-স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাদেরকে মান্যতা দেওয়ানো ওয়ালা রাজ্য (নেপালি, উর্দু, হিন্দি, ওড়িয়া, সাঁওতালি, পাঞ্জাবি, কামতাপুরী-রাজবংশী, কুড়মালি)। ভাইসাব স্থিতি এরকম হয়ে পড়েছে যে লোকেরা মাতৃভাষা ছেড়ে হিন্দি কে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও আবার হিন্দিও উপেক্ষিত। ভাষা যেন স্ট্যাটাস-এর পদক হয়ে পড়েছে।

রইলো কথা কাজের ভাষার তো প্রশ্ন এই যে সরকারগুলো, বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার এই বিশাল জনতার সাথে অপনত্ব কীকরে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে পারে। একটি পুরানো উপায় এই যে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা কে জাতীয় স্তরে একমেব স্থানীয় সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষিত করা যায়। এমনিতে তো ভারতে 'সরকারি ভাষা' (দার্শনিক চর্চায় অথবা জাতীয়তাবাদী প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা' অর্থাৎ জাতীয় ভাষা) -র ধারণা বিদেশ থেকে পাওয়া হলো, কিন্তু ভারতীয় প্রসঙ্গে 'সরকারি ভাষা' (দার্শনিক চর্চায় অথবা জাতীয়তাবাদী প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা' অর্থাৎ জাতীয় ভাষা) -র ধারণা একটি যোগাযোগের ভাষারূপে করা হয়েছিলো না কি কাজের একমেব ভাষারূপে। এই ধারণায় ভারত, ইথিয়োপিয়া, পাকিস্তান, আধুনিক

রুশীয় মহাসজ্ঘ ও ইন্দোনেশিয়া সমতলীয়। কিন্তু দেখার বিষয়, একে তো কংগ্রেস সরকারি ভাষার মোদ্দায় গান্ধীজীর পরামর্শকে ত্যাজে ও অন্যদিকে বিভাজনজন্য ক্রোধজ্বালা থেকে উৎপন্ন হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ উফানে ওঠে। ভালো এই যে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে 'বৈচিত্র্যে ও সৌহার্দ্র্যে একতা'-র মূল্যবোধগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশ এই মামলায় পিছে থাকতে দেখা যায়। অন্য দেশ ভারত থেকে অধিক স্থির হতে পারে, কিন্তু ভারতের মতো সহিষ্ণু ও ভাগ্যবান নয়।

ইন্দোনেশিয়ার হাল ভারতের থেকে ভালো হতে পারে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে মান্যতা দেওয়ানোতে ভারতের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। রুশে সোভিয়েত আমলে রুশি ভাষার দাপট ছিলো, এখন একটু কম বলা যায়। আজকের রুশে প্রত্যেক ভাষাকে আঞ্চলিক স্তরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যদিও আজও রুশির দাপট কায়েম। কিন্তু নতুন যুগে পরিবর্তনের মশাল ধরে ইথিয়োপিয়া ও নেপাল ভাষাধিকারে অগ্রণী। যদিও মাতৃভাষাধিকারের প্রসঙ্গে বুকের ছাতি পেটানেওয়ালা পূর্ববঙ্গ স্বয়ং এতেই পিছিয়ে।

ভারতের সরকারি ভাষা নীতি একটি পুরানো জামানার কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত। চলুন নতুন নতুন তন্ত্রের দেশে কেমন কেমন নীতি গৃহীত হয়েছে এটার পর্যালোচনা করা যাক। রাজতন্ত্র পশ্চাৎ নেপালে সরকারি ভাষা মামলায় কিছু বড় গম্ভীর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যথা নেপালের সকল ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা (= জাতীয় ভাষা) হিসেবে ঘোষিত করা ও আঞ্চলিক স্তরে দপ্তরি কর্মকাণ্ডে অন্যান্য ভাষার প্রয়োগ ও পঠন-পাঠনের অনুমতি প্রদান করা। তবে জাতীয় স্তরে সরকারি ভাষার রূপে নেপালি ভাষাকে একপ্রকারে প্রাথমিকতা প্রদান করানো হয়েছে।

ইথিয়োপিয়ায় **১৯৯১** (উন্নিশ শ একানব্বই)-তে সাম্যবাদী শাসনের পতনের পরে সরকার নেপালের মতো আমহারি কে মুখ্য সরকারি ভাষা ঘোষণা করে বাকি ভাষাগুলো কে বরাবর সংবৈধানিক মান্যতা দেওয়ালো। সাথে সাথে আঞ্চলিক স্তরে অন্যান্য ভাষাকেও সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করানোরও কাজ করলো। সবেমাত্র (২০২০ – দু হাজার

কুড়িতে) ওখানকার সরকার এই আয়লান করলো যে অরঅমো, আফার, সোমালি ও তিগ্রিঞাকে সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়ালো। অর্থাৎ এখন মোট পাঁচটি ভাষা। ইথিয়োপিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবি আহমদ আলি বললেন:

আমহারির একটি বড়ো ভুমিকা এই যে এটি অনেক বছর ধরে ইথিয়োপীয় সমাজের যোগাযোগের ভাষা হয়ে রয়েছে ও বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে সংবাদ সম্প্রেষণ সহজ করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এমন সমাজের গঠনের জন্যে যেটা রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে সমন্বিত হোক, নতূন ভাষাদেরকে সম্মিলিত করা জরুরি। এই নতুন ভাষাগুলো দেশকে জোড়াতে ও ইথিয়োপীয় লোকেদের মাঝে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে।

বলা হয় যে ইথিয়োপিয়ায় ঐক্যের নামে ভাষা চাপানোর অভিযান চালানো হয়েছে। এই কথাটি ঠিক যে আমহারি ভাষা সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভাষিত মাতৃভাষা অরঅমো ভাষা অনেক সময় ধরে উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

নেপাল আর ইথিয়োপিয়ার উদাহরণ অনেক আকর্ষক লাগলো। আমি কিছু কারণে সিংহপুর দেশের বিবরণ দিতে চাইছি না, অন্য সময় এ নিয়ে আলোচনা করবো।

ভারত প্রভৃতি বহুভাষিক দেশের জন্যে যত জরুরি একটি সম্পর্ক ভাষা তার চেয়ে অধিক জরুরি মাতৃভাষায় সেবা পাওয়ার অধিকার। প্রত্যেক প্রসঙ্গে ও প্রত্যেক পৃষ্ঠভূমিতে এই কথাটির সত্যতা স্থাপিত। ভারতের প্রসঙ্গে যদি কিছু করার দরকার পড়ে তো আমার কিছু সুপারিশ কাজে আসতে পারে। সেইগুলোকে নিম্নপ্রদত্ত বিন্দুগুলোতে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করবো।

১। রাষ্ট্রভাষা দ্বন্দ্ব নিরসন হেতু সমস্ত ভাষাগুলোকে এক সাথে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা, যাতে রাষ্ট্রভাষা আছে কি না এই ঝামেলাটার সমাপ্তি দ্রুত ঘটে।

২। ভাষাগুলোর চার বর্গীকরণ করা হোক।

৩। এই চার বর্গীকরণে প্রথম বর্গ স্থানীয় যোগাযোগ ভাষাগুলোর হবে। এতে হিন্দিই (= হিন্দুস্তানিই) নয়, নাগপুরি/সাদরি, অসমীয়া, উড়িয়া, ছত্রিশগড়ি, পঞ্চপরগনিয়া, নেপালি, বাংলা ইত্যাদি বহুসাংস্কৃতিক যোগাযোগ ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যে এলাকায় নিজস্ব একটি যোগাযোগের ভাষা থাকবে সেখানে হিন্দির চাপ ঘটানো হবে। অন্যদিকে যেখানে কোনও যোগাযোগের ভাষা তৈরি হতে পারেনি অথবা কোনও নতুন যোগাযোগের ভাষা পেতে আগ্রহী সেখানে হিন্দি (=হিন্দুস্তানি) অথবা কোনও অন্য যোগাযোগের ভাষার চয়নের ব্যবস্থা করা হোক।

৪। দ্বিতীয় বর্গে সকল ক্লাসিকীয় ভাষাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সংস্কৃত, তামিল, মলয়ালম, কন্নড়, উড়িয়া, বর্তমানে ক্লাসিকীয়। তাই এদেরকে এই বর্গে রাখা হবে।

৫। তৃতীয় বর্গ এমনসব ভাষাগুলোর হবে যাদেরকে যোগাযোগের ভাষার মর্যাদা হাসিল নয়, যথা, ব্রজ, ঔধি, কাশ্মিরি, গুজরাতি, ভোজপুরি, সৌরাষ্ট্রী, কোঁকণি, সরগুজিয়া, তুলু ইত্যাদি।

৬। চতুর্থ হবে আদিবাসি, তফসিলি জাতি, বর্গবিশেষের ভাষা, যথা সাঁওতালি, কুড়ুখ, ত্রিপুরি, রাভা, বড়ো, কোচ, মিজো, চাকমা, মৈতৈলোণ, ইরুল, বড়্গ, তোড় ইত্যাদির বর্গ।

৭। সব কেন্দ্র সরকারের কাজকর্ম ও সুযোগ সুবিধা সকল ভাষায় সম্ভব হতে পারবে। এতে অসংখ্য চাকরি সৃষ্টি করানো যেতে পারে। বিভিন্ন বিশিষ্ট পদ যেমন তরজমাকার, মুদ্রক, ভাষাজ্ঞ ইত্যাদি হতে পারে।

৮। প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক স্থানীয় ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ানো হোক। এর চেয়ে আরও ভালো হয় যদি রাজ্যগুলোর নামকরণ ভাষার ভিত্তিতে না হয়ে সংখ্যা বা অন্য ভিত্তিতে হয়।

৯। কিছু দক্ষিণের লোকেরা বলেন যে ‘আমরা যদি হিন্দি কে গৃহীত করলাম তাহলে ‘হিন্দি’ প্রদেশগুলো আমাদের ভাষাকে গৃহীত করবে?’ কেননা একেই একটি সুজগে পরিণত করি? তাহলে রাজস্থানে আমরা মলয়ালম, পশ্চিমবাংলায় তেলুগু ও মহারাষ্ট্রে তামিলে কাজ করাই, এরথেকে আরও চাকরি সৃষ্টি হবে আর ইংরাজি থেকে অনায়াসে বোঝা সরে যাবে।

১০। নেপালের আদলে বহুভাষিক শিক্ষণতন্ত্র ভারতে গৃহীত করা হোক। সুবিধার জন্যে উত্তর প্রদেশের মতো একটি কিয়ু০ আর০ কোড সহায়িত প্রণালী কার্যকরী হওয়া সম্ভব। নবভারত টাইম্‌স-এর মোতাবেক – *“আধিকারিকরা জানালেন যে উত্তর প্রদেশে শিক্ষকদেরকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিযুক্ত করা হয়। যেমন মেরঠের শিক্ষক কে গোরখপুরে মোতায়ন করা হয়। এমন সময় তাঁদের পড়ানোতে সমস্যা সৃষ্টি না হোক সেইজন্যে হিন্দি পাঠ্যপুস্তকের সামগ্রীকেই স্থানীয় ভাষায় (তরজমা) করা হয়েছে। বইগুলোর সামগ্রী একই রাখা হয়েছে। শিক্ষণে সহায়তা করার জন্যে বইগুলোর মধ্যে একটি একটি বিশেষ সুবিধেও আছে। যে শিক্ষক স্থানীয় ভাষার সাথে অপরিচিততা বোধ করেন সে প্রত্যেক পাঠের জন্য একটি কিয়ু০ আর০ কোড স্ক্যান করতে পারেন। কোড স্ক্যান করতেই পাঠ্যসামগ্রীর অডিও চলতে লাগবে, যাতে বাচ্চারা সেটাকে সহজেই শুনতে ও বুঝতে পারবে।”*

একটি অন্য ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমি এটা তো বলছি না যে সংস্কৃতের শব্দসমূহকে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার না করা হোক। আমি সংস্কৃতায়নের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু কাজের ভাষায় ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে এটাই পার্থক্য যে ইংরেজিতে তাও সামান্য শব্দ চয়নের একটি নির্ধারিত সীমা আছে, কিন্তু আমাদের ভাষাগুলোর কার্যালয়ীন স্বরূপ এতটাই ভয়াবহ যে এর তুলনা যদি শশি তরূরের ইংরেজির সাথে নাই করা হয় তাহলে এটা অনুচিতই নয় বরং অন্যায়ও হবে। কটু লাগতে পারে, কিন্তু সত্য এটাই যে ভাষার তরূরত্ব ভাষার প্রচার প্রসারে ব্যাঘাত সৃষ্টি

করছে। এই কথাটিকে উপেক্ষিত করা পাপের সমতুল্য। আমি একটি পূর্ববঙ্গীয় বাংলা প্রোগ্রামে একটি জিনিশ দেখছিলাম। সেখানে বলা হচ্ছিলো যে সঙ্খ্যাঘটিতভাবে (ডিজিট্যালভাবে) ফর্ম কীকরে ভরা হয়। লেখা ছিল ‘সংরক্ষণ করে অগ্রসর হউন’। আরে দাদা যে কথা কে ‘বাঁচিয়ে এগোন’ বলেও বোঝানো যেতো সেটাকে এমন প্যাঁচানো-ঘোরানোভাবে বলার কী প্রয়োজন?

তাই আমার খেয়াল এটাই যে ভাষীয় স্বাধীনতা কে এক স্তর উঁচু রাখতে কোনও সমস্যা নাই। সে আলাদা কথা কে ভাষাগুলোর উপেক্ষাকারী ও ভাষীয় বিতর্ক ও ঝগড়াকারী ঘটবে না, কিন্তু এদের পরোয়া না করাতেই বিশ্বের মঙ্গল।

सामान्य हिन्दी-विरोध का सकारात्मक पक्ष : कुछ नीतिगत सुझाव जो एक उत्तम भविष्य के इङ्गितक का कार्य कर सकें

सृजन साधुख़ाँ

मैं इसमें धन्यवाद-ज्ञापन एक दक्षिण भारतीय क़लम-मित्र को करना चाहूँगा जिनके साथ परस्पर अनेकों चर्चा करते हुए उत्तर और दक्षिण की भाषाओं में पारस्परिक सम्बन्धों, समसामयिक अन्तर्देशीय एवं विदेशी प्रभावों एवं क्षेत्रीय विचारधारा पर जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला।

हिन्दी भाषा पूरे उपमहाद्वीप में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती ही है, चाहे वह सकारात्मक हो, या, वही नकारात्मक। परन्तु उसकी चर्चा है, और किन्हीं कारणों से तो चलती ही रहेगी।

चलिए नकारात्मक पक्ष पे ही आते हैं, हिन्दी के विरोध का यह पक्ष निरा राजनैतिक है। उत्तरद्वेश की भावना इसमें कण कण में समाहित है। विधर्मी प्रकृति भी एक कारण है, 'विधर्मी' का सन्दर्भ धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। ब्राह्मणद्वेष भी एक कारण है।

हिन्दी का विरोध जायज़ है कि नहीं यह तो हम कुछ ही देर में इसकी चर्चा करेंगे। हमारे लिए जो मायने रखता है वह यह है कि विरोध का प्रकार कैसा है, विरोध का स्वरूप कैसा है और विरोध में निहित विचारधारा कैसी है। और जहाँ तक भाषीय राजनीतिकरण की बात है इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह नाजायज़ हैं। आत्मदाह वाली दीवानगी की मानसिकता कायरता का परिचायक है न कि बलिदान का (कृपया इसे जौहर या सती से जोड़कर न देखा जाए तो उचित होगा, हत्ता कि आज के दौर में जौहर या सती की महत्ता घट गई है)। मैं इसके बारे में कुछ पहलू एक दूसरे लेख में तार्किक रूप से करूँगा।

(मैं यहाँ 'हिन्दी' में हिन्दी और उर्दू दोनों को सम्मिलित कर रहा हूँ ताकि चीज़ों में स्पष्टता आए, सन्दर्भ-भेद होने पर अलग से 'मानक हिन्दी' और 'उर्दू' पदों का भी प्रयोग किया जाएगा।) हिन्दी भाषा निस्सन्देह एक उपमहाद्वीप-व्यापी भाषा है जिसका प्रसार राजकाज, मनोरञ्जन, व्यापर आदि क्षेत्रों में अधिक से अधिक एक सम्पर्क भाषा के रूप में होता चला आया है। देश-विदेशों में इसकी लोकप्रियता है और हमारे दक्षिणवासी सामान्यजन भाई-बन्धुओं में भी इसके प्रति सहिष्णुता साधारणतः दिखाई देती है।

जहाँ तक व्यावहारिक प्रयोग की बात है, ऐसा नहीं कि हर कोई द्विभाषी है, परन्तु यह भी सत्य है कि प्रयास से कहीं न कहीं अन्ततः (न बोल पाने पर भी) हिन्दी समझने वाले मिल जाएँगे। एक भाषा तब सम्पर्क भाषा का आकार लेने लगती है जब उसे लोग, टूटे-फूटे स्वरूप में ही सही, यथासम्भव अन्यभाषी समाज/समाजों तक अपनी बात सम्प्रेषित करने में लगाती है। और इसे किञ्चित हद तक या बुनियादी स्वरूप में विभिन्न अञ्चल के लोगों में सुनी, बोली, समझी जाती है। इसका आशय यह समझना भूल है कि सम्पर्क भाषा जानने वाले अकादमिक स्तर पर पढ़-लिख सकने में सक्षम हैं। इसके कुछ कारक हैं, उच्चारण भेद, वर्तनी भेद, व्याकरण भेद इत्यादि।

कुछ कट्टर क्षेत्रीय(तावादी) लोग इन कारणों से चाहते हैं कि हिन्दी न 'थोपी' जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि 'हिन्दी' को ही समाप्त किया जाए, धीरे धीरे लोग और अधिक हिन्दी के प्रति क्षुब्ध होते जा रहे हैं। ऐसे में एक भूल अवधारणा का जन्म हो रहा है कि क्योंकि हिन्दी एक सम्पर्क भाषा है और इस वैचित्र्यमय भारत में एक विशिष्ट आबादी मात्र की भाषा हिन्दी है अतः इसे भाषीय साम्राज्य का नाम दिया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत हमारे अनुभव उत्तर में काफ़ी अलग हैं। माना कि कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक भाषा के तौर पर हिन्दी को गृहित किया जा चुका है, परन्तु 'हिन्दी-पट्टी' के कुछ हिस्से अपने आप में वैचित्र्यमय हैं, यही नहीं, क्षेत्रीय स्तरों पर अलग अलग भाषाओं का सम्मान दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है, कुछ

‘हिन्दी प्रदेशों’ में इन्हें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं तो इन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

तेलङ्गाणा दक्षिण का एकमात्र पूर्ण राज्य है जहाँ एक से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त राजभाषाएँ हैं। इसके विपरीत ‘हिन्दी प्रदेशों’ में छत्तीसगढ़ में ‘हिन्दी’ और ‘छत्तीसगढ़ी’ राजभाषाएँ हैं। झारखण्ड ने १७ राजभाषाओं को आधिकारिक घोषित किया है, ये न ही केवल हिन्दी प्रदेशों में, बल्कि समस्त भारतवर्ष में सर्वाधिक है। ‘अहिन्दी प्रदेशों’ में केवल पश्चिम बङ्गाल ही ऐसा राज्य है जिसने अन्यान्य भाषाओं को क्षेत्र के आधार पर राजभाषा भी बढ़ाया और साथ ही राजभाषाओं कि सङ्ख्या में बढ़ोतरी भी की। यह भी बता दें कि मानक हिन्दी पश्चिमबङ्गाल में भी एक राजभाषा है। यही नहीं, पश्चिमवङ्ग भारतवर्ष में सर्वाधिक ग़ैर-स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दिलाने वाला राज्य है। भाईसाहब हालात ऐसे हैं कि लोग मातृभाषा को छोड़ कर हिन्दी को अधिक महत्त्व दे रहे हैं, कहीं कहीं तो हिन्दी भी उपेक्षित है। भाषाओं में छोटा बड़ा किया जा रहा है। भाषा मानो स्टेटस का तग़मा बन गया है!

रही बात कार्य की भाषा की तो प्रश्न यह है कि सरकारें, विशेष रूप से केन्द्र सरकार इस विशालकाय जनता से अपनापन का नाता कैसे जोड़ें। एक पुराना उपाय यह है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर एकमेव स्थानीय राजभाषा घोषित किया जाए। यों तो भारत में राजभाषा (फ़लसफ़ी चर्चाओं अथवा राष्ट्रवादी सन्दर्भ में राष्ट्रभाषा) की समझ विदेशों से प्राप्त हुई, परन्तु भारतीय सन्दर्भ में राजभाषा (फ़लसफ़ी चर्चाओं अथवा राष्ट्रवादी सन्दर्भ में ‘राष्ट्रभाषा’) की धारणा एक सम्पर्क भाषा के तौर पर हुई थी न कि कार्य की एकमेव राजभाषा के तौर पर। इस धारणा में भारत, इथियोपिया, पाकिस्तान, आधुनिक रूसी महासङ्घ और इण्डोनेशिया समपृष्ठीय हैं। लेकिन देखने को यह भी मिलता है कि एक तो कॉङ्ग्रेस राजभाषा के मुद्दे पर गान्धी के सुझावों को त्यागती है तो दूसरी ओर विभाजन-जन्य क्रोध-ज्वाला से उत्पन्न हिन्दी साम्राज्यवाद अपने चरम पर आ जाती है। अब अच्छा यह है

कि यहाँ के जनमानस में 'वैचित्र्य में सौहार्द्रय और एकता' के मूल्य पाए जाते हैं। पर अन्य देश इस मामले में कुछ पीछे रहते दिखाई देते हैं।

अन्य देश भारत से अधिक स्थिर हो सकते हैं, पर भारत जितना भी सहिष्णु और सौभाग्यशाली नहीं। इण्डोनेशिया का हाल भारत से बढ़कर हो सकता है, पर क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दिलाने में भारत से पीछे है। रूस में सोवियत दौर में रूसी का बोलबाला था, अब थोड़ा कम माना जा सकता है। आज के रूस में हर भाषा को क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है, यद्यपि आज भी रूसी का दबदबा जारी है। पर नए युग में परिवर्तन की मशालें पकड़े इथियोपिया और नेपाल भाषाधिकार में अग्रणी हैं। जबकि मातृभाषाधिकार-विजय का ढिण्ढोरा पीटने वाला पूर्ववङ्ग स्वयं इसी में पिछड़ा है।

भारत की राजभाषा नीति एक पुराने दौर के ढाँचे पर आधारित है। चलिए नए नवेले तन्त्रों वाले देशों ने क्या-क्या नीतियाँ अपनाई इसे जान लेते हैं।

राजतन्त्र-पश्चात् नेपाल में राजभाषा के मामले में कुछ बड़े गम्भीर क़दम उठाए हैं, यथा नेपाल की सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा घोषित करना और क्षेत्रीय स्तर पर राज-काज के कार्यों में अन्य भाषाओं के प्रयोग और पठन-पाठन की अनुमति प्रदान करना। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में नेपाली भाषा को एक प्रकार से प्राथमिकता मिली हुई है।

इथियोपिया में १९९१ में साम्यवादी शासन के पतन के पश्चात् सरकार ने नेपाल की ही तरह अम्हरी को मुख्य राजभाषा घोषित कर बाक़ी भाषाओं को समान संवैधानिक मान्यता दिलाई। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलाने का काम किया। हाल ही में (२०२०) वहाँ कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि ऑरॉमो, अफार, सोमाली और तिग्रिञा को भी राजभाषा के तौर पर भी स्वीकृति दिलाई गई है। यानी अब कुल पाँच भाषाएँ। इथियोपिया के वर्तमान प्रधानमन्त्री आबी अहमद अली ने कहा:

अम्हारी की एक बड़ी भूमिका इसमें रही है कि यह सालों से इथियोपियाई समाज में हमारी सम्पर्क भाषा रही है और विभिन्न लोगों के बीच सम्प्रेषण सुगम करने में मदद करती आई है। परन्तु ऐसे समाज को निर्माण करने हेतु जो राजनैतिक और आर्थिक रूप से समन्वित हो, नई भाषाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। ये नई भाषाएँ देश को जोड़ने और इथियोपियाई लोगों के दरमियान सम्पर्कों को उन्नत करने में सहायक होंगी।

कहा यह जाता है कि इथियोपिया में एकता के नाम पर भाषा को थोपने का उपक्रम चलता रहा है। यह बात सही है कि अम्हारी भाषा सबसे लोकप्रिय भाषा है परन्तु सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा ऑरॉमो भाषा को काफ़ी समय से उपेक्षित रखा गया था।

नेपाल और इथियोपिया के उदाहरण काफ़ी लुभावने लगे। मैं कुछ कारणों से सिंहपुर देश का ब्यौरा अभी नहीं देना चाह रहा हूँ, उसकी बात कभी और की जा सकती है।

भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए जितना आवश्यक एक सम्पर्क भाषा है उससे अधिक आवश्यक मातृभाषा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। हर प्रसङ्ग, हर सन्दर्भ एवं हर पृष्ठभूमि में इस बात की सत्यता स्थापित है। भारत के सन्दर्भ में अगर कुछ किया जा सकता है तो मेरे कुछ सुझाव इस सन्दर्भ में काम आ सकते हैं। उन्हीं को निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट करने की चेष्टा करूँगा।

१) राष्ट्रभाषा-द्वन्द्व के निरसन हेतु सभी भाषाओं को एक साथ राष्ट्रभाषा घोषित करना, ताकि राष्ट्रभाषा है या नहीं इस झगड़े का समापन तुरन्त हो जाए।
२) भाषाओं के चार वर्गीकरण किए जाएँ।
३) इन चार वर्गीकरणों में प्रथम वर्ग स्थानीय सम्पर्क भाषाओं का रहेगा। इसमें हिन्दी ही नहीं, नागपुरी, असमिया, ओड़िया, छत्तीसगढ़ी, पञ्चपरगनिया, नेपाली, बङ्गाली आदि बहुसांस्कृतिक सम्पर्क भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा। जिन इलाकों में अपनी ही एक सम्पर्क भाषा हो वहाँ हिन्दी का दबाव घटाया जाए, दूसरी ओर जहाँ कोई सम्पर्क

भाषा नहीं बन पाई है या कोई नई सम्पर्क भाषा पाने को आग्रही है वहाँ हिन्दी अथवा किसी भी भाषा के सम्पर्क भाषा के रूप में चयन की सुविधा उपलब्ध हो।

४) दूसरा वर्ग सभी क्लासिकी भाषाओं का रहेगा। संस्कृत, तमिऴ्, तेलुगु, मलयाळम्, कन्नड़, ओड़िया वर्तमान में क्लासिकी हैं। तो इन्हें इस वर्ग में रखा जाएगा।

५) तीसरा उनका जिन्हें अभी तक सम्पर्क भाषा का दर्जा हासिल न हुआ हो। ब्रज, अवधी, कश्मीरी, गुजरती, भोजपुरी, छिलटी, सौराष्ट्री, कोंकणी, सरगुजिया, तुळु आदि भाषाएँ इसमें सम्मिलित होंगी।

६) चौथा वर्ग अलग से आदिवासी, जनजाति, वर्गविशेष की भाषाओं की हो सकती है। इनमें सन्ताड़ी, कुड़ुख़, त्रिपुरी, राभा, बड़ो, कोच, मिज़ो, चकमा, मैतै, ईरुळ, बड़ग, तोड़ आदि भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

७) सभी केन्द्र सरकार के कामकाज और सुयोग-सुविधाएँ सभी भाषाओं में सम्भव हो पाएँगे। इससे लातादाद नौकरियाँ उत्पन्न कराई जा सकती हैं। विभिन्न विशिष्ट पद जैसे अनुवादक, मुद्रक, भाषाज्ञ आदि हो सकते हैं।

८) हर प्रदेश में हर स्थानीय भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। इससे और भी बेहतर यही होगा यदि राज्यों के नाम भाषा पर आधारित न होकर सङ्ख्या या किसी और चीज़ पर आधारित हों।

९) कुछ दक्षिण के लोग यह ताना मारते हैं कि हमने 'अगर हिन्दी को गृहित कर लिया तो क्या 'हिन्दी' प्रदेशों में हमारी भाषाओं को गृहित करेंगे भला?' क्यूँ न इसी को अवसर में बदल दें? फिर राजस्थान में हम मलयाळम्, बङ्गाल में तेलुगु और महाराष्ट्र में तमिऴ् में कार्य कराएँ, इससे और नौकरियों का सृजन होगा, अङ्ग्रेज़ी से अनायास बोझ हट जाएगा।

१०) नेपाल की तरह बहुभाषिक शिक्षण प्रणाली भारत में अपनाई जाए। सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश की भाँति एक क्यू०आर० कोड सहायित प्रणाली कारगर साबित हो सकती है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक़ – *"अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक एक*

क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पोस्ट होते हैं। जैसे मेरठ के शिक्षक को गोरखपुर में तैनाती दे दी जाती है। ऐसे में उसे पढ़ाने में कोई समस्या न हो इसलिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक की सामग्री को ही स्थानीय भाषा में किया गया है। किताबों का कॉन्टेट वही रखा गया है। शिक्षण में मदद करने के लिए किताबों में एक विशेष सुविधा भी है। जो शिक्षक स्थानीय बोली के साथ फ्रेंडली नहीं हैं वे प्रत्येक पाठ के लिए एक क्यू०आर० कोड स्कैन कर सकते हैं। कोड स्कैन करते ही किताब की पाठ्य सामग्री का ऑडियो चलने लगेगा। जिससे बच्चे उसे आसानी से सुन और समझ सकते हैं।"

एक और पहलू पर मैं कहना चाह रहा था। मैं यह तो नहीं कहता कि संस्कृत के शब्दों को पुस्तकों में न प्रयोग किया जाए। मैं संस्कृतिकरण के लिए साधुवाद जताता हूँ। परन्तु कार्य की भाषा के रूप में अङ्ग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं में इतना अन्तर है कि अङ्ग्रेज़ी में तब भी सामान्य शब्द-चयन की एक निर्धारित सीमा है, पर हमारी भाषाओं के कार्यालयीन स्वरूप इतने भयावह हैं कि इसकी तुलना अगर शशि तरूर की अङ्ग्रेज़ी से न की गई तो यह अनुचित ही नहीं वरन् अन्याय भी होगा। कटु लग सकता है, पर सत्य यही है की भाषा की तरूरता या तरूरियत भाषा के प्रचार प्रसार में बाधा पहुँचा रही है। इस बात को उपेक्षित करना पाप के समतुल्य है। मैंने एक पूर्ववङ्गीय बङ्गाली प्रोग्राम में एक चीज़ देखी, उसमें बताया जा रहा था कि अङ्कीय (डिजिटल) तौर से फ़ॉर्म कैसे भरे जाते हैं। लिखा था 'संरक्षण करके अग्रसर हों'। अब भैया जिस बात को 'सहेज कर आगे बढ़ें' ऐसे भी बताया जा सकता था उसे इतनी पेचीदी बनाने का क्या प्रयोजन?

अतः मेरा ख़याल यही है कि भाषीय स्वतन्त्रता को एक स्तर ऊँचा रखने से कोई बुराई नहीं होगी। वह अलग बात है कि भाषाओं को उपेक्षित करने वाले और भाषीय बहस और झगड़े कराने वाले घटने नहीं वाले, पर इनकी परवाह न ही की जाए तो इस दुनिया का भला है।

इति